Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

Doi https://doi.org/10.67841/pgp.260501025 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Detective Stories from the Pens of 19th Century Women Writers

উনিশ শতকের মহিলা লেখিকার কলমে গোয়েন্দা গল্প

Shreya Talukder
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 18th April 2026
Accepted on: 04th May 2026

Abstract:
In the nineteenth century, Bengali detective fiction took a new turn at the hands of women writers. Detective stories ceased to be merely tales of murder, injury, and theft; instead, they emerged with a primary focus on humanity.

Key Words:
Testament, Daniel, Futile, Akka, Honor, Thereafter, Epic, Vedas, Upanishads.

মূল প্রবন্ধ

মানুষ যখন জঙ্গলে বসবাস করত তখন গাছপালা, প্রকৃতিকে দেবতা বলে পুজো করত। আর খাদ্যের সন্ধানে শিকারকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তখন থেকেই গোয়েন্দা গল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তাই কবে থেকে ঠিক গোয়েন্দা গল্পের উদ্ভব ঘটেছে বলা মুশকিল। সুকুমার সেন বলেছেন — "শিকারীর কাজ ও গোয়েন্দাগিরি দুই-ই এক ব্যাপার — গোপনে অনুসন্ধান করে ফাঁদ পেতে অথবা আঘাত করে আয়ত্ত করা।"[১]

আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে পুরনো বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যের গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্য পাঠ করে থাকি তবে দেখব তার ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে আছে রহস্য উন্মোচনের কথা যা কখনো মানুষ বা পশুর দ্বারা ঘটে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি — 'ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত আট সুক্তে' কথা। যেখানে ধরা পড়েছে সত্যযুগে দেবতাদের মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবে গরু। আর সেই গরুকে বিদেশি ডাকাত বা বেনে যাদের 'পণি' বলা হয় তারা চুরি করে নিয়ে যায়। আর সেই চুরি যাওয়া গরুকে 'সরমা' নামের এক কুকুর সন্ধান করে আনে। এছাড়া আমরা যদি ইংরেজি সাহিত্যের দিকে তাকাই সেখানে দেখব 'বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বইতে 'দানিয়েলের গল্প'এ অপরাধের কথা আছে। আক্কাদের রাজধানী ব্যাবিলন সেখানে সকলে প্রতিমা 'বেল'কে পুজো করেন। অসীম প্রতাপশালী প্রধান পুরোহিতকে রাজাও সমীহ করেন। কারণ প্রধান পুরোহিত বলেন, দেবতা জাগ্রত এবং প্রত্যহ তিনি এসে প্রসাদ আহার করে যান। কিন্তু হঠাৎ একদিন ব্যাবিলনে দানিয়েল নামে এক জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে আর তিনি সকলকে বলেন, "দেবপ্রতিমা নির্জীব, দেবপ্রতিমার পূজা করা নিরর্থক।"[২] কারণ তিনি আকারে বিশ্বাসী নন। এতে রাজা রেগে গিয়ে দানিয়েলকে বললেন যদি দেবতা না থাকেন তবে প্রতিদিনের প্রসাদ কী হয় তা তাকে প্রমাণ করতে হবে। নচেৎ 'মৃত্যুদণ্ড পাবে'। প্রথম দিন দানিয়েল ব্যর্থ হন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষ ইচ্ছে হিসেবে দানিয়েল একদিন সময় চেয়ে নেন এবং প্রমাণ করে দেন, পুরোহিত আসল দোষী। তিনি দেবতার কথা বলে প্রত্যহ সমস্ত প্রসাদ নিজে ভক্ষণ করেন।

© Santiniketan Sahityapath

সময় যত এগিয়েছে গোয়েন্দা গল্প ততই স্বাবলম্বী হয়েছে। বলা যায় বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির উদ্ভব ইংরেজি ও ফরাসি গোয়েন্দা সাহিত্যের আবির্ভাবের পরেই। ফরাসি গোয়েন্দা সাহিত্য এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন নেপোলিয়নের সময় পুলিশি ব্যবস্থা শুরু হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা কিছু নির্মাণ তার মূল আধার হিসেবে আমরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ধরে থাকি যার মূল পুরুষ। সেইভাবে গোয়েন্দা সাহিত্যের রাশ প্রারম্ভে পুরুষের হাতেই ছিল। ইংরেজি লেখক এডগার অ্যালান পো, আর্থার কোনান ডয়েলের হাত ধরেই ইংরেজি সাহিত্যে ক্রাইম কাহিনির অগ্রগতি।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বঙ্গে ঠগী, ডাকাতদের প্রাদুর্ভাব ভীষণ ছিল। তার থেকে মুক্তি পেতে 'কর্ণেল শ্লীম্যান কমিশনার' তৈরি করা হয়। সেখানে কয়েকজন দারোগা নিযুক্ত হয়। সেই দারোগাদের মধ্যে একজন ভীষণ ধূর্ত ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। লোকমুখে তাঁর নাম ছিল 'বকাউল্লা'। পরবর্তী সময়ে নাম হয় 'বাঁকাউল্লা' যিনি ঠগী ও ডাকাতদের শায়েস্তা করেন। প্রথমে ১৮৫৫ সালে এই গল্পগুলি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। পরে ১২টি আখ্যায়িকা নিয়ে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মামুদ হাতি'।

এরপর আর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' গল্প প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় অপরাধমূলক কাহিনি রচনার সিংহদ্বার খুলে যায়। এরপরে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর', গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগা কাহিনী' প্রকাশিত হয়। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে পুরুষ নারী একে অপরের কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে জীবন প্রতিপালন করে চলেছেন। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় লিখেছেন —

পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।[৩]

আর তাই 'ভারতী' সাহিত্যপত্রের সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুপ্রেরণায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১২৯৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'চুরি না বাহাদুরি' গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন যাকে গোয়েন্দা সাহিত্যের নতুন পালক বলা যায়। এরপরে ধাপে ধাপে রচিত গোয়েন্দা কাহিনিগুলি নবীন-প্রবীণ-কিশোর সকলের মন জয় করে নেয়।

অপরাধমূলক কাহিনি রচনার লেখক শুধু পুরুষ নন। মহিলা লেখিকারাও লেখার দক্ষতা দেখালেন। উনিশ শতকের পতিব্রতা, কর্মব্রতা নারী হয়েও সমাজের ধুলো পড়া ক্যানভাসে বড়ো বড়ো হরফে লিখলেন — 'দেখ আমরাও পারি'। সমাজ সর্বদা মেয়েদের গণ্ডিবদ্ধ জীবন দিতে প্রস্তুত। জন্মলগ্নে থেকেই তাদের টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি-বেঁধে, গায়ে হলুদ মাখিয়ে, রান্নাবাটি খেলনা দিয়ে নারীতে পরিণত করতে উদ্যোগী। সিমোন দ্যা বোভোয়ার কথায় — "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ-কেউ নারী হয়ে ওঠে।"[৪] সেই সময়ের নারী হয়ে পুরুষ গোয়েন্দা লেখকদের পাল্লা দিয়ে সরলাবালা দাসী (সরকার) লিখে ফেললেন গোয়েন্দা গল্প 'ঘড়িচুরি' যা পরবর্তী সময়ে ১৩১০ সালে কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সরলাবালা দাসী (সরকার) উনিশ শতকের বাংলা মহিলা গোয়েন্দা লেখিকা হিসেবে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। তিনি যেন তাঁর কলমের স্পর্শে মহিলা গোয়েন্দা লেখিকাদের সলতে পাকানোর পর্ব শেষ করে প্রদীপ জ্বালানোর কথা বলেছেন। আব্রুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে নয় সমাজের সামনে মাথা উঁচু করে নিজস্ব সত্তাকে প্রস্ফুটিত করেছেন লেখনীকলার মধ্যে দিয়ে।

'ঘড়িচুরি' গল্পের বিষয় — বহু মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট মানের একটি ঘড়ি যা হরিভূষণবাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। ঘড়িটি হরিভূষণের দাদা ফণিভূষণের কাছে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন সেটি ঠিক করতে তিনি ভাই হরিভূষণের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। হরিভূষণের দাদা ফণিভূষণ রাজবাড়ির স্টেশন মাস্টার পদে কর্মরত। তাই যথারীতি ঘড়ি সারিয়ে হরিভূষণ বাড়ির পরিচারিকার হাত দিয়ে পোস্টমাস্টার রাজকৃষ্ণবাবুর কাছে দিয়ে আসেন ঘড়ি পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তার পরবর্তী ক্ষণে। ঘড়ি পেয়ে দাদা ভাইকে চিঠি লিখে জানান — "তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটি অতি অল্প দামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি।"[৫] তখন হরিভূষণ তাঁর বন্ধু পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ডিটেক্‌টিভ মহেন্দ্রবাবুর দ্বারস্ত হন। মহেন্দ্রবাবু প্রথমত হরিভূষণের বাড়ি তল্লাসি করেন। তারপর সেই ঘড়ি হরিভূষণ যে পরিচারিকা বামার হাত দিয়ে পোস্ট অফিসে

© Santiniketan Sahityapath

পাঠিয়েছিলেন তার বাড়িও অনুসন্ধান করেন। এমন কি পোস্টমাস্টার রাজকৃষ্ণবাবুর থেকেও খোঁজ নেন এবং জানতে পারেন — ''দুটার সময় দার্জিলিং মেলে দিবার জন্য পার্শেল রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলেন।''[৬]

এরপর মহেন্দ্রবাবু হরিভূষণবাবুকে নিয়ে পুলিশ ডিটেকটিভ শেখরবাবুর কাছে যান। তাঁর পুরো নাম সুধাংশুশেখর বসু। মানুষটি অন্যরকম। কারো সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশেন না কিন্তু ব্যবহার অমায়িক, ''তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জন ও উপাধি অর্জন করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই।''[৭] তারপর তাঁর কর্মস্থলে একটি ভীষণ দুর্বোধ স্বভাবের লোক শীর্ষস্থান অধিকার করে বসার পরে তিনি স্বেচ্ছায় কর্ম থেকে বিরতি নেন।

শেখরবাবু হরিভূষণের কাছে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা জানতে চান এবং তাঁর দাদা ফণিভূষণের পাঠানো চিঠি নিরীক্ষণ করতে থাকেন — ''ভায়োলেট কালিতে লেখা নাম ঠিকানা, আর এখানকার ও রাজবাড়ির পোস্টমার্ক, ইহা ভিন্ন খামে এখন কোন চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কি কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।''[৮] কিছুপরে তিনি খাম থেকে চিঠি বের করেন এবং মহেন্দ্রবাবুর কাছে জানতে চান তিনি এ বিষয়ে কী বুঝেছেন — ''বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফসিট। কাগজখানি ছিঁড়বার সময় বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেননা পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্টে ভায়োলেট কালিতে লেখা, অপর পৃষ্টায় কালো কালো দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধ হয়, কোন একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।''[৯] তাৎক্ষণিকভাবে শেখরবাবু প্রথমে স্ত্রীলোকের লেখা চিঠি বলে অনুমান করেন। আর তার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কারণ চিঠির গায়ে 'দেলখোসের গন্ধ', ''স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। লিখিবার সময় কালি ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছাপ পড়িয়াছে, এরূপ অপরিষ্কার লেখা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক সম্ভব।''[১০] আর তাতে হরিভূষণ সম্মতি জানান যে বৌদি এমন কাগজ ব্যবহার করেন।

অতঃপর হরিভূষণবাবুর কথায় গল্প নতুন মোড় নেয়। তিনি বলেন যখন তিনি দাদা ফণিভূষণকে ঘড়িটি পাঠান তখন ঘড়িতে দশটার দম দিয়ে দেন এবং সঙ্গে থার্মোমিটার পাঠান। এতে শেখরবাবু বুঝতে পারেন কেউ ঘড়ির শব্দ শুনে এবং প্যাকেটের থার্মোমিটার স্পর্শ করে তা চুরি করে নিয়েছেন। এরপর পোস্টমাস্টার শেখরবাবু রাজকৃষ্ণবাবুকে ডেকে পাঠান আর চুরি যাওয়া ঘড়িটি তাঁর থেকে উদ্ধার করেন, ''আপনার ঘড়িটা দিন তো সময়টা দেখি। রাজকৃষ্ণবাবু ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটা একটা কালো রংয়ের কারে বাঁধা ছিল। শেখরবাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাস দিয়া কারের গিরা বাঁধা জোড়ার জায়গাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।''[১১]

'ঘড়িচুরি' গল্পের মধ্যে দিয়ে সরলাবালা দাসী এটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে রহস্য গল্পে শুধু খুন, জখম, অপরাধীকে শনাক্ত করে রাজদ্বারে পাঠানো যথেষ্ট নয়। কোথাও যেন মানবিকতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাই শেখরবাবু বড়ো মাপের গোয়েন্দা হয়ে অপরাধীকে তা জেনেও তাঁকে এই কাজ থেকে দূরে থাকার কথা বলেছেন। কারণ অপরাধী রাজকৃষ্ণবাবুর বাবা বিদ্যাভূষণ একজন সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ অল্প বয়সে সবেমাত্র সরকারি চাকরি পেয়েছেন। তাই যাতে তাঁর জীবনের চলার পথ থমকে না যায়, শেখরবাবু তাঁকে সংশোধনের পথ দেখিয়েছেন, ''আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কলিকাতায় আসিয়া ও নূতন চাকরিতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। — কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশ সংশোধিত হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণবাবুর ঘড়িটি অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দিবেন।''[১২]

'ঘড়িচুরি' গল্পে আর একটি দিক চোখে পড়ে। তা হলো গল্প বলার কৌশল। গল্পটি শুরু হয়েছে — ''সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, এজন্য সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হই নাই। শেখরবাবু তখন রাস্তার কাছে ইজিচেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন; আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়া ছিলাম। তখন সবেমাত্র চায়ের পিয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটি আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়াছিল।''[১৩] গোয়েন্দা গল্প যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে এসেছে তার একটি ছাপ সরলাবালা দাসী (সরকার) গল্পে স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি আর্থান কোনাল ডয়েলের মতো গন্ধ শুঁকে অপরাধী

শনাক্ত করার কথা বলেছেন — "ডিটেকটিভ বিভাগে কাজ করলে ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধের পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক।"[১৪]

প্রতিভা বসু প্রথমে রাণু সোম নামে সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। এরপর 'চুরির তদন্ত' গল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রথম শিশু গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটান। হৈমন্তী দেবীর নাতি অন্তু। সে দিদার সঙ্গে শান্তিনিকেতন ঘুরতে এসেছে। "বয়স এগারোর কাছাকাছি।"[১৫] বই পড়তে ভালোবাসে সে। ডিটেকটিভ বই বেশি পছন্দের। বড়ো হয়ে অন্তু ডিটেকটিভ হতে চায়। বর্তমানে দিদা হৈমন্তী দেবীর ইচ্ছে হয়েছে অন্তুর স্বাদে রদবদল ঘটাবেন। তাই — "সুমন মুখার্জি এখানকার এস.ডি.পি.ও., হৈমন্তী দেবীর বন্ধুর ছেলে অন্তুর বেকার অবস্থার দুষ্টুমি দেখে একটা দাবার সেট কিনে এনে দিয়েছে।"[১৬] আর সে তা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিয়েছে। সুমন কাকুর সঙ্গে অন্তু ভীষণ ভাব এর মধ্যে অন্তু কাকুর সঙ্গে গিয়ে গোয়েন্দা দেখে এসেছে এবং তার সঙ্গে দাবা খেলে। কিন্তু — হঠাৎ হৈমন্তী দেবী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর একটা ঝালি যা তিনি আলমারিতে রেখেছিলেন যাতে 'সাড়ে তিন হাজার' টাকা ছিল তা চুরি হয়ে যায়। প্রথম সংশয় হয় বাড়ির দুই পরিচারিকা পদ্মা ও রঙ্গিকে যারা তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী। তাদের তিনি বলেন— "দ্যাখ তোরা ছাড়া তো বাইরের কেউ নেই, কে নেবে? যদি হঠাৎ লোভবশত করে থাকিস আমাকে বল, আমি এ-নিয়ে কাউকে কিছু বলব না।"[১৭] কারণ পদ্মা হৈমন্তী দেবীর আয়া। প্রায় সাত-আট বছর আগে পদ্মাকে হৈমন্তী দেবী পথ থেকে তুলে আনেন। বাবা মা নেই, জ্যাঠার সংসারে থাকত তারাও তাকে তাড়িয়ে দেয়। যাদের অবলম্বন করে কলকাতায় কাজ খুঁজতে তাদের থেকেও দলছুট হয়ে যায়। সেই থেকেই হৈমন্তী দেবীর কাছে থাকে। পদ্মাকে হৈমন্তী দেবী কন্যা স্নেহে ভালোবাসেন। তার বিয়ে তিনি ঠিক করেছেন বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে — "টেন পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে এখন কোন গ্যারেজে কাজ শিখে মেকানিক হয়েছে, ভলো রোজগার করে, ছেলেও খুব ভালো।"[১৮] হৈমন্তী দেবীকে দেখভাল করার সঙ্গে পদ্মা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে। আর যেদিন ঝালিটা চুরি হয় সেদিন হৈমন্তী দেবী পদ্মাকে সেটি আলমারিতে রাখতে দিয়েছিলেন। আর সে তা রেখেছিল আলমারির মাঝের তাকে। তবে রাখার সময় বলেছিল — "সবাই বলে, দেখবেন আপনার এই ঝালি একদিন চুরি হয়ে যাবে। কেউ সুযোগ বুঝে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে যাবে।"[১৯] সেই কারণে পদ্মার ওপর সন্দেহ হয়। পদ্মা নিজের বিয়েতে একটা সোনার হার চেয়েছিল ।

অন্যদিকে রঙ্গি শান্তিনিকেতনের মকরমপুরের আদিবাসী মেয়ে। তিন বছর ধরে হৈমন্তী দেবীর শান্তিনিকেতনে বাড়ি দেখভাল করে। সংসারে কেউ নেই। তার একটা মেয়ে ছিল। সুন্দরী হওয়ার জন্য অল্প বয়সে এন. সি. সি সাহেব তাকে বিয়ে করে দিল্লী নিয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই। রঙ্গির খুব ইচ্ছে একটা 'রূপহার পৈছে' পরার। সে কথা সে হৈমন্তী দেবীকে বলেছে। এতে তিনি মনে করেন হয়তো লোভে পড়ে সে ঝালিটাকে চুরি করেছে। এমত অবস্থায় তাদের প্রতি সংশয় তৈরি হতে পদ্মা ও রঙ্গি বলে — "বিশ্বাস করো আমরা নিই নি মা। আমরাও অবাক হয়ে যাচ্ছি ঝালিটা গেল কোথায়! অতগুলো টাকা। ওদিকে আলমারি বন্ধ।"[২০]

গল্পের মোড় বদল ঘটে এস. ডি. পি .ও. সুমন মুখার্জি ও অন্তু বাড়িতে ফেরার পর। হৈমন্তী দেবী ঝালি চুরির কথা বলেন সুমনকে — "বেলা দেড়টা নাগাদ ওটা খুলে আমি টাকা বার করেছি, তারপর তালা বন্ধ করেছি; তারপর আমার সামনে পদ্মা আলমারি খুলে ঝালি রেখে আলমারি বন্ধ করে চাবি আমার হাতে দিয়েছে।"[২১] কিন্তু দাশুকে টাকা দিতে গিয়ে তিনি দেখেন ঝালি নেই। সুমনবাবু প্রাথমিকভাবে পদ্মা ও রঙ্গিকেই অবিশ্বাস করেন। এবং তাদের ডেকে ধমকান। এতে অন্তুর ভীষণ কষ্ট হয়। কারণ সে পদ্মাদিদিকে ভীষণ ভালোবাসে — "পদ্মাদিদিকে কেন বকছ, পদ্মাদি নেয়নি।"[২২] পরদিন যখন পুলিশ-দারোগা এসে পদ্মা ও রঙ্গিকে থানায় তুলে নিয়ে যাবার জন্য হুমকি দেয় তখন অন্তু ভীষণ কষ্ট পায়। দিদা হৈমন্তী দেবীর প্রতি ভীষণ রেগে যায়। সে চেষ্টা করে পদ্মা ও রঙ্গিকে বাঁচানোর। তখন একটা ফন্দি আঁটে — "সব ঘর ঘুরে রান্নাঘরে এল। দেখল দরজাটা আধো-খোলা, সংলগ্ন চাতালের রোদে পদ্মাদি আর রঙ্গি শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা রোজ এরকম ঘুমোয়। তাদের পাশ কাটিয়ে সে বাইরে এল। কিন্তু তারা জেগে গেল না, আর তক্ষুনি মনে হল চোর এভাবেই ঢুকেছিল। সে আবার পাশ কাটিয়ে যেন চোর ঢুকছে সেভাবেই ঘরে ঢুকল, এখনও তারা টের পেল না। এবার অন্তু সন্তর্পণে দিদার মাথার কাছে এসে আস্তে চাবিটা নিল। তবু দিদা টের পেলেন না। চাবি নিয়ে আলমারি খুলল। মজা তো! তবে তো চোর এই পথেই এসে এইভাবে আলমারি খুলে চুরি করেছে; যেখানে ঝালিটা ছিল হাত দিল সেখানে। কোণের দিকে কী একটা

হাতে লাগতে টেনে এনে দেখল একটা ছোট গোল, চারপাশে সোনালি কাজ করা আয়না। বুকের ভিতর বিদ্যুৎ চমকে উঠল। চকচক করল চোখ, বুঝে ফেলল চোর মশায়টি কে।"[২৩]

অন্তু চোর খুঁজে পেয়েছে। মুখে তার প্রসন্ন শান্তির ছাপ। পদ্মা দিদি আর রঙ্গি দিদিকে থানায় যেতে হবে না। এতে অন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কারণ দিদাকে সে এবার বলবে চোর আসলে কে, যে কিনা দিদা হৈমন্তী দেবীর কলকাতার প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবের নাতি ভোম্বল। তার বাবা পেশায় ব্যারিস্টার অবিনাশবাবু। ভোম্বলের বয়স সতেরো। লেখাপড়ায় ভালো নয়। কিন্তু দেখতে সুন্দর। কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে ঘুরতে এসেছে। বন্ধুদের সঙ্গে হৈমন্তী দেবীর বাড়িতে উঠেছে। অন্তু তাকে পছন্দ করে না কারণ — "আমি একদম দেখতে পারি না ভোম্বলদাকে। আমি ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হই বলে একা পেলেই আমার মাথায় টকাটক চাঁট মারে, আর বাড়ির কাকে দেখলে আদর করে।"[২৪] এই কথা শুনে হৈমন্তী দেবী ভীষণ রেগে যান ও অন্তুকে বকাবকি করেন। এতে অন্তু ভীষণ কষ্ট পায়। তারপর শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন হৈমন্তী দেবী, "টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করে দরকার নেই। যা গেছে গেছে। কারা নিয়েছে সে তো বোঝাই গেল। রঙ্গিকে ছাড়িয়ে দিয়ে যাব। ব্যবস্থা যা হয় কলকাতা গিয়ে হবে। এখানে থাকাটা অন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে।"[২৫] সেদিন রাতে অকস্মাৎ রাত্রি সাড়ে নয়টার ট্রেনে অবিনাশবাবু শান্তিনিকেতন আসেন যা দেখে হৈমন্তী দেবী হকচকিয়ে যান। বাড়ি তখন শান্ত সকলেই নিদ্রামগ্ন। অবিনাশবাবু এসে স্বীকার করেন তাঁর ছেলে ভোম্বল হৈমন্তী দেবীর ঝালি চুরি করেছে, "চুপিচুপি দুপুরবেলা এসে আপনার আলমারি থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করেছে। সিনেমার হিরো হবে। ওই টাকা নিয়ে পালিয়ে বোম্বে যাচ্ছিল আর-এক বন্ধুর সঙ্গে। ওর মা ধরে ফেলেছেন। আমার হাতে যথেষ্ট মার খেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, এ-টাকা সে কোথায় পেল, কীভাবে চুরি করল।"[২৬]

প্রতিভা বসু তাঁর 'চুরির তদন্ত' গল্পের অন্তু চরিত্রটিকে একজন গোয়েন্দা হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সে বয়সে অল্প হলেও শুধুমাত্র একটা 'আয়না' দেখে চোরকে শনাক্ত করে ফেলেছিল। আর তার কথা বিশ্বাস না করায় দিদা হৈমন্তী দেবীর প্রতি তার অভিমান হয়।

গোয়েন্দা গল্পের প্রারম্ভ থেকেই দেখা যায় শুধু রহস্যের জন্য রহস্য নয় মানবিকতা কোথায় যেন বড়ো একটা স্থান অধিকার করে আছে যা উনিশ শতকের গোড়ায় মহিলা গোয়েন্দা লেখিকাদের কলমে ফুটে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দা সাহিত্য নিজস্ব ছাঁচের বদল ঘটিয়েছে অনেক। কিন্তু শুভারম্ভের সেই শৈলির ধারা বজায় রেখেছিল। কেবলমাত্র অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে কারাবাস দেওয়া নয়, বহির্বিশ্বে অপরাধীকে বদলের পথ লেখিকারা করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১। 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১
২। ওই, পৃ. ১৪
৩। 'সঞ্চিতা', কাজী নজরুল ইসলাম, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ডি এন লাইব্রেরি ১৪, অক্টোবর ১৯২৮, পৃ. ৪০
৪। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', মল্লিকা সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৬
৫। 'গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা', রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৮, চতুর্দশ মুদ্রণ নভেম্বর ২০২১, পৃ ১২৯
৬।ওই, পৃ. ১৩১
৭। ওই, পৃ. ১২৮
৮। ওই, পৃ. ১২৯
৯। ওই, পৃ. ১৩০
১০। ওই, পৃ. ১৩২
১১। ওই

© Santiniketan Sahityapath

১২। ওই, পৃ. ১২৮
১৩। ওই, পৃ. ১৩০
১৪। 'সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য', অরুণ চট্টোপাধ্যায়, পুনশ্চ , ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৫৯, পৃ. ১৬৫
১৫। ওই, পৃ. ১৬
১৬। ওই, পৃ. ১৬৬
১৭। ওই, পৃ. ১৬৪
১৮। ওই, পৃ. ১৬৫
১৯। ওই, পৃ. ১৬৭
২০। ওই, পৃ. ১৬৯
২১। ওই
২২। ওই, পৃ. ১৭১
২৩। ওই
২৪। ওই, পৃ. ১৭২
২৫। ওই
২৬। ওই

সহায়ক গ্রন্থ:

- পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গোয়েন্দা-সাহিত্য ব্যোমকেশ বক্সী ও অন্যান্য', ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৩
- বিশ্বজিৎ কর্মকার, 'গোয়েন্দা সাহিত্য অপরাধ মনস্তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি', লহর পাবলিকেশন হাউসবি-৫/৪৪, কল্যাণী নদীয়া, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২১
- সুকুমার সেন, 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৮

—

© Santiniketan Sahityapath